এক সাহসী মা ও মেয়ের গল্প

■ তৃষা মহাজন

পঙ্গুত্বকে কিভাবে পরাজিত করে সমাজে স্বাবলম্বী হওয়া যায়, মা দীপা মালিক ও মেয়ে দেবিকা তার একটি জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। তারা পক্ষাঘাতকে জয় করে সমাজে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সমর্থ হয়। কিভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করল তারা সেই গল্প বলবে পাঠককে। দৈহিক শক্তির চেয়ে মনের জোর অনেক বেশি। দীপা মালিক ও দেবিকা আজ সমাজের রোল মডেল।

দীপার বুকের নিচে সমগ্র দেহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। আর দেবিকার শরীরের একপাশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। দেবিকার এই সমস্যার কারণ তার মস্তিষ্কের একাংশ ধ্বংস বা বিনাশ হওয়া। কিন্তু তারা কারো সহানুভূতি বা করুণা ভিক্ষা করতে রাজি নয়। জীবনের ভাঙাগড়া, দুঃখ-কষ্টের সাথে সংগ্রাম করে তারা জয়ী হয়।

দীপা এক কর্নেলের কন্যা এবং তার বাবাও ছিলেন পদাতিক বাহিনীর একজন কর্নেল। ১৫ বছর ধরে দীপা হুইলচেয়ারে চলাফেরা করে। কিন্তু সে একজন সাঁতারু, সাইকেল চালক, উদ্বুদ্ধকারী বক্তা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একজন কর্মী সদস্য। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হলো খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক। দীপা অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং দুই সন্তানের মা।

এতসব কিভাবে সম্ভব হলো? সেই গল্পই বলছি পাঠককে।

তখন দীপার বয়স ছয়। তখন ধরা পড়ল তার একটা টিউমার বা ফোড়া হয়েছে, যা হোক ৯ বছর বয়সে দেখা গেল সে স্বাভাবিক সুস্থ। তখন সে সাইকেল চালানো, ক্রিকেট ও বাস্কেটবল খেলা শুরু করে। সেই সাথে সাঁতার। কিন্তু ৩০ বছর বয়সে আবার সেই টিউমার দেখা দিলো। মেরুদণ্ডের ভেতরে মেরুরজ্জুর সন্নিকটে। তখন থেকে দীপার বুকের নিচের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এজন্য তার তিনটি সার্জারি হলো ওই টিউমারের জন্য। এ জন্য তাকে ১৮৩টি সেলাই দেয়ার প্রয়োজন হয়। দীপার নিজের কথায়– 'টিউমার অপসারণের জন্য আমার তিনটি মেজর সার্জারি হয়। আমার মস্তিষ্ক থেকে পানি বের হয়। ফলে আমি কোমায় চলে যাই। ডাক্তার তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। আমার বক্ষের নিম্নাংশের সাথে সকল সংযোগ হারাই। কারণ মেরুরজ্জু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আজো আমাকে নিয়মিত টিউমার চিকিৎসা নিতে হয়। আর কোনো সার্জারি করা সম্ভব নয়। কারণ আমার ডিস্ক কাটা পড়েছে শুধু টিউমার অঞ্চলে পরিষ্কার করতে। মাঝে মাঝে আমাকে রেডিয়েশন নিতে হয়, যাতে টিউমার সেল নিচে থাকে।'

ইতোমধ্যে দীপার স্বামী কারগিল যুদ্ধে চলে যান। কিন্তু দীপা সাহসিকতার সাথে সব সমস্যার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যায় একাকী।

দীপার কথায়– আমার বাবা-মাকে ধন্যবাদ জানাই তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য। আমার মনে পড়ে, আমাকে যখন সার্জারির জন্য নেয়া হলো, আমি লক্ষ করলাম কিভাবে বাইরের ওয়ার্ডকে একটি জীবাণুমুক্ত আইসিইউতে (ICU) পরিণত করা যায়। প্রতি ঘণ্টায় একটা হেলিকপ্টার আহত যোদ্ধাদের নিয়ে নামছে। তারা কেউ পঙ্গু, কেউ মৃত্যুপথের যাত্রী অথবা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারা। এসব দেখে মনে হলো ওরা যদি এই অবস্থার সাথে লড়তে পারে, আমি কেন পারব না। আমি সাহস পাই। শক্তি পাই।

দীপার সৎ সাহস ও ব্যক্তিত্ব তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আমি খুশি হই ঈশ্বরের দয়ার জন্য। আমি মানসিকভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ি। আমি মনে দুটি চিন্তা– এক. আমার স্বামী যুদ্ধে রত, দুই. মেয়ে দেবিকার চিকিৎসা।

যা হোক, সার্জারির পর সার্জন যখন আমার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আমার ভেন্টিলেটর খুলে নিলেন, আমি তখন মাকে ডাক দিলাম। মা তখন হাসপাতালে আমার মেয়ের দেখাশোনা করছে।

অন্য সময়, ডাক্তার আমাকে জানালেন, আমার মস্তিষ্ক থেকে পানি বের হচ্ছে এবং তিনি সার্জারির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি তখন তাকে বলি, আপনি আরেকবার আমাকে বিবস্ত্র দেখার সুযোগ পেলেন। অর্থাৎ আমি এখন কেমন আছি। এর পরে কেমন হতে পারি। মনে মনে হাসি।

দীপা হুইলচেয়ার গ্রহণ করে হাসিমুখে। সে জানত যে, আগে থেকেই সে হুইলচেয়ারের রোগী। তার ওই হুইলচেয়ার গ্রহণ কেউ সহজভাবে গ্রহণ করেনি। সে শিখেছে এভাবে কী করে জীবন যাপন করা যায়। এমন অবস্থায় কিভাবে প্রস্রাব ও মলত্যাগ করা যায়। কিভাবে সাংসারিক কাজকর্ম করা যায়। তার কন্যার অসুখের জন্য সে নিজেকে দায়ী করে। এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও দীপা নিজেকে আরেকজন স্বাভাবিক মানুষ থেকে পৃথক মনে করত না। সে যা করতে চাইত, তা করেই ছাড়ত।

এক সময় দীপা সাইকেল চালাত। আবার সে সাইকেল চালাতে চায়। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক সে তার শরীরের ওপর অংশে শক্তি আনয়ন করতে, আবার জিমে যেতে থাকে। সাঁতার কাটা শুরু করে। ছয় মাস একজন ক্রীড়াবিদের সহায়তায় নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তোলে। দীপা ক্রীড়া জগতে যোগদান করে। এক বছরের মধ্যে দীপা আন্তর্জাতিকভাবে পদকপ্রাপ্ত হলো।

দীপার মেয়ে দেবিকার গল্পও কম নয়। দেবিকা Congenital Hemiplegia রোগে আক্রান্ত হয় শৈশবে। ফলে দেরিতে হাঁটা শেখে। লেখা লিখিতে সে ধীর গতি। অন্যান্য শিশুরা যখন পুতুল খেলায় মত্ত। দেবিকা তখন সিম নিয়ে খেলত। কেন? তার হাতের আঙুলে শক্তি নেই। তাই আঙুলগুলোকে স্বাভাবিক শক্তিধর করতে ওই সিম নিয়ে খেলা। তার প্রতিটি আঙুলকে স্বাভাবিক করতে সব প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। দেবিকা তার মাকে দেখেছে, কিভাবে হুইলচেয়ারে বসে সব কাজ করেছে। তাই দেবিকাও ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তোলে তার সব প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করতে।

আজ ২৫ বছরের দেবিকা। দুই বোনের মধ্যে

সে বড়। সে এখন ব্যাঙ্গালুরেতে Sports Psychology-তে M. Phil করছে। সে এখন স্বীকৃত মনস্তাত্ত্বিক উপদেষ্টা। সে এশিয়ান প্রতিনিধি, Commonwealth Youth Sports for Development and Peace Working group. ২০১৪-১৫ সালে সে Queen's Young Leader award পেয়েছে।

যা হোক, আজ পর্যন্ত তাকে সাইকোথেরাপি নিতে হয় দেহের বাম পাশকে কর্মক্ষম রাখার জন্য।

আমার পুরো পরিবার সব সময় কোনো না কোনো খেলাধুলার সাথে জড়িত ছিল। এটা আমাদের লাইফস্টাইল বলা চলে। আমি কখনো কোনো দলভুক্ত খেলোয়াড় ছিলাম না। তবে দৌড়াতাম এবং সাইকেল চালাতাম। আমার মা যখন পেশাগতভাবে ২০০৬ সালে Para Sports-এর সাথে জড়িত হন, তখন থেকে আমি তার সাথে ভ্রমণ করতাম। জাতীয় পর্যায়ে আমি ১০০ মিটার দৌড়ে অংশ নিয়েছি। দীর্ঘ লাফেরও প্রতিযোগিতা করেছি।

জীবনের নানা প্রতিকূল অবস্থার সাথে সংগ্রাম করে মা ও মেয়ে ক্লান্ত নয়। নিরাশ বা হতাশ নয়। তারা হাত-পা ছেড়ে বসে থাকতে রাজি নয়। কারণ তারা জানে, জীবনের পথ ফুল বিছানো নয়। কাঁটা বিছানো।

এক বছর আগে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, তারা wheeling Happiness Found নামে একটি সংগঠন করবে। এখানে যাদের দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক সাপোর্ট প্রয়োজন; তাদেরকে সহযোগিতা করা হবে। এখানে কোনো সামাজিক মর্যাদা, বয়স বা শিক্ষাগত যোগ্যতা গণ্য করা হবে না। এর আর্থিক সাহায্য আসবে দাতা ব্যক্তিদের চাঁদা ও সর্বসাধারণের সাহায্য থেকে।

দীপা দেশের Para Sports Scenario-এর ব্যাপারে দুঃখবোধ করে। সে বলে, 'আমাদের কোনো প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা নেই বা তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহের জন্য কোনো কমিটি নেই। আমরা Para athlets-দের Target Olympic Podium Scheme-এর ভেতর সংযুক্ত করতে পেরেছি।'

দীপা ও দেবিকা ভারতের Para Sports-এর বর্তমান অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করছে। দেবিকা পরের বছর যুক্তরাজ্যে Disability Sports Psychology-তে PhD করতে যেতে চায়। কারণ সে বিশ্বাস করে, এ বিষয়ে পরবর্তী গবেষণা Para athlets-কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। অপর পক্ষে চির যৌবনা দীপা তার জীবনের কার্যাবলির মধ্যে অলিম্পিকের অঙ্গুরিপ্রাপ্তির আশা রাখে। আশা করে, আরো কিছু কৃতিত্ব তার Para Sports Foundation-এর তহবিল উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সম্প্রতি প্রতিদিন প্রশিক্ষণ পাচ্ছে কিভাবে সমাজের উন্নতি করা যায়। তাদের মতো পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের কিভাবে পুনর্বাসন করা যায়।

আমরা সবাই তাদের এ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে সালাম জানাই।

– হেলথ ম্যাগাজিন ডেস্ক